১৯৫৮-র বাংলা ছবি — অর্ধশতাব্দীর দূরত্ব থেকে

অনুপম চক্রবর্তী

সময়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের কোনো একটি খণ্ডকে কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতে স্বর্ণযুগ বা ওই জাতীয় কোনো চরম উপাধি দেওয়ার মধ্যে একধরনের অপরিণতিবোধের প্রকাশ রয়েছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে। তবে রেওয়াজটা এরকমই। বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে যে সময়টাকে স্বর্ণযুগ বলা হয় তার ভিত্তিটা তৈরী হয়েছিল পাঁচের দশকের মূলত শেষার্ধে। আরো নির্দিষ্ট করে বললে *পথের পাঁচালী* ও ঠিক তার পরবর্তী বেশ কিছু বিশ্বমানের ছবির হাত ধরে বাংলা ছবির দৃঢ় পায়ে হাঁটতে শেখা। পাঁচের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক মাঝামাঝি থাকা ১৯৫৮ তাই বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসের নিরিখে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও চলচ্চিত্রের ছাত্রদের কাছে ঔৎসুক্য জাগানো বছর। অর্ধশতবর্ষের দূরত্ব থেকে তাই এই নৈর্ব্যক্তিক ফিরে দেখা।

১৯৫৮ সালে যেসব বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছিল তাদের মধ্যে যে তিনটি ছবি সবচেয়ে সাড়া জাগানো সেগুলি ছিল *জলসাঘর*, *পরশপাথর* ও *অযান্ত্রিক*। বলা বাহুল্য, প্রথম দুটি সত্যজিৎ রায় ও তৃতীয়টি ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে সত্যজিৎ-কৃত চিত্রনাট্যে *জলসাঘর* বাংলার সেমি-ফিউডাল জমিদারদের অর্থনৈতিক

ক্ষয়িষ্ণুতার পাশাপাশি আভিজাত্যের জগদন্তমিনারে চড়ে থাকার অনিঃশেষ স্বপ্নের পেছনে দৌড়ে ক্রমশ ফুরিয়ে যাওয়ার কাহিনী। অত্যন্ত ডিটেলে এবং সত্যজিৎ রায় সুলভ ট্রিটমেন্টে আন্তর্জাতিক মান স্পর্শ করা। এই বাংলা ছবিটি সমস্ত স্তরে প্রশংসিত ও বাংলা ছবির সাবালকত্বের কৃতিত্বের অন্যতম দাবীদার। *নিউইয়র্ক টাইমস*-এ Bosley Crowther থেকে *গার্ডিয়ান*-এর Derek Malcolm সকলেই উচ্ছসিত ছিলেন *জলসাঘর* নিয়ে। Roger Ebert-এর গ্রেট মুভিস বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে ল্যাণ্ডমার্ক ফিল্ম হিসাবে ঠাঁই পেয়েছে *জলসাঘর*। ছবিটির কাহিনীবিন্যাসের পাশাপাশি এটি ভারতীয় মার্গসঙ্গীত (কণ্ঠ ও যন্ত্র)-এর বেশ কিছু অসামান্য ফুটেজে সমৃদ্ধ। শাস্ত্রীয় নৃত্যশৈলীরও বেশ কিছু নিদর্শন এই ছবিতে রয়েছে। বিলায়েত খাঁ-কৃত সুরে এই ছবিতে যেসব শিল্পীরা ক্যামেরার সামনে এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বেগম আখতার, রোশন কুমারী, সহশিল্পীদের নিয়ে ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ, ওয়াহিদ খাঁ (সুরবাহার বাদক) ও সালামত আলি খাঁ।

সত্যজিৎ নির্দেশিত ১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত আরেক ছবি *পরশপাথর*। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এর কাহিনী অবলম্বনে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবির বিত্তবান হবার স্বপ্নের নির্মান-বিনির্মানের দোলাচল নিয়ে সিরিও-কমিক ছবি *পরশপাথর*। কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা ছবির জগতে গ্যামারের বিচারে মধ্যবিত্ত তুলসী চক্রবর্ত্তীর অসামান্য অভিনয়ক্ষমতার চুড়ান্ত বিকাশের ছবিও *পরশপাথর*। তাঁকে মনে রেখেই চিত্রনাট্যটি লিখেছিলেন সত্যজিৎ। অপু-ট্রিলজির শেষ ছবি *অপুর সংসার* মুক্তি পাবার আগেই এ ছবি সত্যজিতের পরিচালক সত্তার বহুমুখীতার একটি দিকচিহ্ন।

এবছরই মুক্তি পেয়েছিল ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত *অযান্ত্রিক*। বাংলায় আরেকটি আন্তর্জাতিক মানের ভাবনার ছবি। *জলসাঘর*-এ সত্যজিৎ যেমনভাবে দেখিয়েছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রকে

গ্রাস করছে নবাগত বৈশ্যনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা, সেরকমই প্রযুক্তির ক্রমশ বিকাশে যন্ত্রের সাথে কোনো মানবিক সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠা সম্ভব বা উচিত কিনা অর্থ ও পণ্য নিয়ন্ত্রিত সমাজ এজাতীয় 'দুর্বলতা' কে প্রশ্রয় দেবে কিনা এরকম কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী এবং আজও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ঋত্বিক তুলেছিলেন তাঁর *অযান্ত্রিক*-এ, আজ থেকে ৫০ বছর আগে। বিমলের বিখ্যাত সংলাপ ''ওরা বুঝতে চায়না যে জগদ্দলও মানুষ''। এই 'ওরা'-দের সংখ্যা যে ক্রমবর্দ্ধমান তা ঋত্বিক ধরতে পেরেছিলেন সেই '৫৮ তেই। *অযান্ত্রিক*-এর ক্যামেরা ও শব্দপ্রয়োগ বাংলা ছবির ক্ষেত্রে নতুন স্বাদের। জগদ্দলের হেডলাইটের প্রায় স্বাধীন বিচলন অথবা ইঞ্জিনে জল ঢালার সময় তৃষ্ণার্ত মানুষের জল খাওয়ার শব্দের প্রয়োগে যন্ত্র ও মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছিল।

মানুষ আর যন্ত্রের এই সম্পর্ক শহুরে শিক্ষিত মানুষের কাছে এক আধপাগলা মানুষের কাহিনী। তারা নদী, সমুদ্র, পাহাড় কে ভালবাসতে পারে কিন্তু যন্ত্রের ক্ষেত্রে কোথাও যেন অদৃশ্য সীমান্তরেখা টানা থাকে! ঋত্বিক বলেছিলেন ''যন্ত্র ও মানুষের এই সম্পর্ক শিশু, গ্রামের সাধারণ কৃষক, কিংবা সরল আদিবাসী মানুষ সহজেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু যন্ত্র যাদের সবচেয়ে কাছে থাকে সেই শহরের মানুষ মানতে পারে না।'' এ সম্পর্কে ঋত্বিকের প্রায় দৈববাণী সুলভ উচ্চারণ ছিল ''যন্ত্র যুগে যন্ত্রের সঙ্গে আবেগের সম্পর্কই ভবিতব্য।''

অযান্ত্রিক-এর মতই ১৯৫৮-এর আরেকটি সাড়া জাগানো ছবি *নীল আকাশের নীচে*। ঋত্বিক ঘটক আর মৃণাল সেন পরিচালিত দুটি ছবিরই মুখ্য চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন কালী ব্যানার্জ্জী। ১৯৫৫ তে প্রথম ছবি *রাতভোর*-এর পরই মৃণাল সেনের পরিচালিত দ্বিতীয় ছবি ছিল *নীল আকাশের নীচে*। বাংলা ছবির জগতে 'নিও-রিয়্যালিস্ট' ভাবধারায় প্রথম দিককার ছবি। এটি চীনা রেশম ব্যবসায়ী ওয়াংলু নামে সৎ মানুষের গল্প। কলকাতায় ওয়াংলুর এক খরিদ্দারের

স্ত্রী বাসন্তী-র সঙ্গে তার ভগ্নিপ্রতিম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাসন্তী বামপন্থী মনোভাবাপন্ন এক স্বাধীনচেতা নারী। তাঁর প্রভাবে ওয়াংলু উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরে যায় তার স্বদেশের বন্ধুদের সঙ্গে জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে। মার্কসীয় প্রভাবের কারণে সেন্সরবোর্ড ছবিটিকে প্রায় দু-মাসের জন্য ছাড়পত্র পেতে অপেক্ষা করিয়ে রাখে। বাসন্তী চরিত্রে মঞ্জু দে-র অভিনয় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'ও নদীরে' এ ছবির মূল্যবান সম্পদ।

১৯৫৮ তে মুক্তি পেয়েছিল তপন সিংহ পরিচালিত দুটি ছবি *লৌহকপাট* ও *কালোমাটি*। জরাসন্ধের উপন্যাস অবলম্বনে বন্দীজীবনে কারাদণ্ড প্রাপ্ত মানুষগুলির আনন্দ-বেদনা, প্রেম, আবেগ-এর এক বিশ্বাসযোগ্য, নিরপেক্ষ চলচ্চিত্রায়ন *লৌহকপাট*। একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর চরিত্রে কমল মিত্রের স্টাইলাইজড কণ্ঠস্বর-নির্ভর অভিনয় ছেড়ে অসামান্য রূপদান ছাড়াও পার্শ্বচরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও নির্মলকুমারের অভিনয়ও এ-ছবির সম্পদ।

রমাপদ চৌধুরীর ছোটোগল্প অবলম্বনে কয়লাখনির শ্রমিকদের দুর্বিষহ জীবনের লেখচিত্র অঙ্কিত হয়েছে *কালোমাটি* ছবিটিতে। খনি শ্রমিকদের পাশাপাশি অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে এক নিষ্ঠাবান সমাজকর্মীর চরিত্র। যে ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন অরুন্ধতী দেবী। কোলিয়ারীতে ক্রেশ তৈরী করার স্বপ্ন দেখে এই মানুষটি। অদ্ভুত মমতাময় চরিত্রচিত্রণে তপন সিংহের পরিচালক সত্তার এক ব্যতিক্রমী নিরীক্ষা এই *কালোমাটি*।

যে সময়কে কেন্দ্র করে এই আলেখ্য, সে সময়ের বাংলা চলচ্চিত্র বিষয়ক সমস্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য মহানায়ককে অনুল্লেখিত রাখলে। ১৯৫৮ তে উত্তমকুমার অভিনীত যে ছ-টি ছবি মুক্তি পেয়েছিল সেগুলি হল — *যৌতুক, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, ডাক্তারবাবু, ইন্দ্রানী, মানময়ী গার্লস স্কুল,* ও *সূর্যতোরণ*।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে *রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত* ছবিতে শ্রীকান্ত-র ভূমিকায় উত্তমকুমারের অভিনয়, এক বাঈজীর প্রতি, সমাজের প্রান্তিক এক নারীর প্রতি শ্রীকান্তর সহনুভূতিশীল মনের অপূর্ব প্রকাশকে যথোচিত প্রজ্ঞায় পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যদিও শ্রীকান্ত চরিত্রটির যে কাঠিন্য, তাঁর দেহের যে বর্ণনা আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পাই, তার সঙ্গে উত্তমকুমারের সাদৃশ্য কতটা সে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু বাঙালীর হৃদয়ে শ্রীকান্ত বললে যে উত্তমকুমারের অবয়বটিই আবছাভাবে ফুটে ওঠে তার জন্য উত্তমকুমারের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য।

স্বাধীনতা উত্তর জাতীয়তাবাদ প্রভাবিত সময়ে একদিকে নিও-রিয়ালিস্টিক ভাবধারা, অন্যদিকে সদ্য-স্বাধীন দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যতিক্রমী ভাবনার মিশেল ও সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি রোমান্টিসিজম সমস্ত কিছুর প্রভাব বাংলা ছবিতেও পড়েছিল, ১৯৫৮ সালের উত্তমকুমার অভিনীত দুটি ছবি *ইন্দ্রানী* ও *সূর্যতোরণ*-এও দেখি এরই বহিঃপ্রকাশ।

ইন্দ্রাণী-তে এক ব্যক্তি মানুষের অনুন্নত সমাজকে প্রায় একা হাতে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করবার স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ আর হার না মানা জেদের শেষপর্যন্ত মাথা উঁচু করে টিকে থাকার কাহিনী। উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের ভূমিকায় উত্তমকুমার ও চাকুরীরতা স্ত্রী *ইন্দ্রাণী*-রূপী সুচিত্রার রোমান্টিকতার ঘাত প্রতিঘাতের আড়ালে স্বপ্ন দেখানো মানুষ ছবি বিশ্বাসের জীবনমুখী রোমান্টিকতা, কোনটি বেশী প্রয়োজনীয়, সময় কোনটিকে বেছে নেবে এজাতীয় প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে দর্শক শেষপর্যন্ত দেখতে পায় এই দুই রোমান্টিকতা আসলে প্রতিস্পর্ধী নয়, এদের উভয়ের মিশ্রণে গড়ে উঠতে পারে নতুন ভারত — এমনই এক রঙীন কল্পনার সুখস্পর্শে ছবিটির সমাপ্তি হয়। কিন্তু কোনো পরিণত পথনির্দেশ শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় না, পথনির্দেশ করা কোনো ছবির লক্ষ্য হতে হবে এমনটিও নয়, তবু এক ব্যতিক্রমী আশা জানিয়ে শেষপর্যন্ত

প্রথাগত পরিসমাপ্তি ঘটানোর কারনেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই, ছবিটি দর্শকধন্য হয়নি, তবে গীতা দত্তের গাওয়া সিনেমায় ব্যবহৃত গানগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

*সূর্যতোরণ*ও এরকমই ব্যক্তি প্রচেষ্টায় সমষ্টির দুঃখ লাঘব করবার মহৎ কিন্তু প্রায় অবাস্তব ধারণার মিশেলে তৈরী ছবি। প্রযুক্তিবিদ স্থপতি, স্বপ্ন দেখা মানুষের ভূমিকায় উত্তমকুমার স্বপ্ন দেখে *সূর্যতোরণ* নামে এক বাড়ি তৈরি করবার যেখানে সব বস্তিবাসী, প্রান্তবাসী মানুষদের মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে। নানা প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর শেষপর্যন্ত সফল হয় সে। তৃপ্ত হয় দর্শকমন।

আসলে প্রাযুক্তিক উন্নতির চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে ছবির জগতে হাজারো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতিতে আমরা পঞ্চাশ বছর আগে করা সাদাকালো বাংলা ছবিগুলির নির্মানশৈলীতে, অভিনয় দক্ষতায় বা সংলাপ ব্যবহারের যেসব ত্রুটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছি, সময়ের প্রেক্ষিত বিচার করলে তা আর ততটা যুক্তিহীন বলে মনে হয় না।

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ বা পরবর্তীতে অসাধারণ পরীক্ষামূলক বাংলা ছবির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল এই সময়টাতেই। তাক লাগানো প্রতিভার বেশ কিছু ঝলকও আমরা দেখেছি এই বছরেই। তাই পঞ্চাশ বছর আগের ছবিগুলির কাছে নব্যযুবক বাংলা সিনেমা নতজানু হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থী।

———